দৈনিক সংবাদ

তারিখ 15 DEC 1992

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দেশের বৃহত্তম গণকবর

।। মলয় ভৌমিক ।।

হর্টিকালচারের উত্তরে জোহা হল সংলগ্ন দেশের বৃহত্তম গণকবর। ছবিঃ সংগ্রহ

রাজশাহী, ১৪ই ডিসেম্বর।– রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নানা ঘটনার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিশালাকৃতির গাছ–গুলোর হাঁটু পর্যন্ত সম্প্রতি চুনের আস্তর লেপে দেয়া হয়েছে। কোন কোন গাছের সাদা ঐ আস্তরের ওপর আবার ছাত্রশিবির মেরে রেখেছে চিকা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটমান সাম্প্রতিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি গাছগুলোর নিম্নাংশ চুনকাম করে দেয়ায় অনেকেই রসিকতা করে বলছেন ঃ বিশ্ব–বিদ্যালয়টি এখন সেনানিবাসে রূপান্তরিত হয়েছে। নতুন প্রজন্মের এসব 'রসিক' ছাত্র–ছাত্রীর অনেকেই হয়তো জানে না, ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আজকের সবুজ মতিহার একটি ক্যান্টনমেন্টের ভূমিকাই পালন করেছে। তাদের হয়তো এ তথ্যও জানা নেই, বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গণকবরটিও রয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদ্দির মধ্যে। দেশ–বাসীকে জানানোর মত আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাও রাজশাহী বিশ্ব–বিদ্যালয়ে ঘটে। একাত্তরের ৩রা অথবা ৪ঠা মার্চে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার পক্ষে শিক্ষকরা অভিমত ব্যক্ত করেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর আগে–পরে রাজ–শাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটেছে অনেক গুরু–ত্বপূর্ণ ঘটনা। এরমধ্যে কোন কোন ঘটনা যেমন আমাদেরকে বেদনাভারাক্রান্ত করে, আবার কোন ঘটনা তেমনই আমাদের প্রতিদিনের সংগ্রামে অনুপ্রেরণা যোগায়।

৩রা মার্চ অনুষ্ঠেয় পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ২৮শে ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া স্থগিত ঘোষণা করলে দেশবাসী ক্ষোভে ফেটে পড়ে। এই ক্ষোভের ঢেউ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কেও স্পর্শ করেছিল। ৩রা মার্চ শহীদুল্লাহ কলা ভবন প্রাঙ্গণে ক্ষুব্ধ ছাত্র–শিক্ষক–কর্ম–চারীরা পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে দেয়। এরপর ছাত্র সমাজ ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে শহরে মিছিল নিয়ে এগিয়ে যায়। এদিকে শিক্ষক সমিতির সভায় স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার জন্য শিক্ষকদের অধিকাংশই অভি–মত প্রকাশ করেন। এই অভিমতের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত হয় যে, শিক্ষকদের মতামত বঙ্গবন্ধুকে জানিয়ে দেয়া হবে এবং তিনিই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। এরপর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি দেন। যে ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন ঃ এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

মার্চের প্রথমার্ধেই ছাত্র–ছাত্রীরা বিশ্ব–বিদ্যালয় ত্যাগ করে চলে যায়। ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। ঐ রাতেই তাদের হাতে প্রথম শহীদ হন প্রশাসন ভবনের গার্ড আবদুর রাজ্জাক। ২৬শে মার্চ সকালে পাক–বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ভবন থেকে এর আগে উত্তোলিত কালো পতাকাগুলো নামিয়ে ফেলে। এরপর তারা রাজশাহী শহরের যত্রতত্র ব্যাপক গণহত্যা চালায়। এপ্রিলের প্রথমদিকে বীর জনতা আর তৎকালীন ইপিআর বাহিনীর সাহসী ভূমিকার কারণে পাক সেনারা কিছুদিনের জন্যে সেনানিবাসে আটকা থাকতে বাধ্য হয়। পরে ঢাকা থেকে অতিরিক্ত সৈন্য এসে পড়ায় পাকবাহিনী পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ১৩ই এপ্রিল বিকেলে পুনরায় রাজশাহী বিশ্ব–বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। এই সময় থেকে মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিনটি পর্যন্ত পাক–বাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের কন্–সেন্ট্রেশন ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করেছে।

ক্যাম্পাস দখলের পর সেখানে বিপুল অস্ত্রের মজুদ গড়ে তোলা হয়। এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহেরশেষে এক মধ্যরাতে পাক সেনারা শহীদুল্লাহ কলাভবনের সামনের শহীদ মিনারটি এক্সপ্লোসিভ বেঁধে উড়িয়ে দেয়। শুরু হয় ক্যাম্পাস এবং এর আশপাশের এলাকায় ব্যাপক গণহত্যা, ধর্ষণ আর লুটপাট। মতিহারের সবুজ চত্বরের যেসব স্থানে আজ ছাত্ররা মিছিল করে, পরস্পর পরস্পরের ওপর সন্ত্রাসী আক্রমণ চালায় অথবা পড়ন্ত বিকেলে যেসব স্থানে আড্ডা জমায় একাত্তরে সেসব স্থান পাক–বাহিনীর পদভারে ছিল প্রকম্পিত।

মুক্তিযুদ্ধের সময় অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক সুখরঞ্জন সমাদ্দার ও অধ্যাপক মীর আবদুল কাইয়ুমসহ প্রায় অর্ধশত শিক্ষক–কর্মচারী–ছাত্রকে পাক–বাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করে। তৎকালীন দু'জন উপাচার্যসহ প্রশাসনের বেশ ক'জন কর্মকর্তা এ ব্যাপারে পাক–বাহিনীকে সহায়তা করে। অভিযোগ পাওয়া যায়, তৎকালীন উপাচার্য ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন ৩৭ জন শিক্ষক ও ২ জন কর্মকর্তার নাম তালিকাভুক্ত করে তাদের মৃত্যুদন্ড প্রদানের জন্য পাকবাহিনীর কাছে সুপারিশ করেছিলেন। ঐ সময়ে কয়েকজন বাঙ্গালী শিক্ষকও পাক–বাহিনীর কর্ম–কান্ডে ইন্ধন যোগান বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

১লা জুন দেশের সব কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয় খোলার নির্দেশ দেয়া হলে পাক–দখলদার বাহিনী রাজশাহী বিশ্ব–বিদ্যালয়ের অন্যান্য ভবন ছেড়ে দিয়ে জোহা হলে গিয়ে আস্তানা গাড়ে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রেল ষ্টেশন সংলগ্ন শহীদ জোহা হল ছিল পাক–সেনাদের কৌশলগত ঘাঁটি। বৃহত্তর রাজশাহীর বিভিন্ন এলাকা থেকে রাজাকার আলবদরদের সহযোগিতায় কয়েক হাজার মানুষকে এই ঘাঁটিতে ধরে আনা হয়। এদের মধ্যে অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত অমানুষিক নির্যাতন ভোগের পর পাক–বাহিনীর হাতে প্রাণ বিসর্জন দেন। এই ঘাঁটিতেই পাক–বাহিনী লুটে নেয় অসংখ্য মা– বোনের উজ্জত।

জোহা হল ক্যাম্পে ধরে এনে নির্যা–তনের পর যাদের হত্যা করা হয় তাদের কোন রকমে মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়ে–ছিল হর্টিকালচারের উত্তরের বধ্যভূমিতে। ১৯৭২ সালের ২৩শে এপ্রিল এইখানেই আবিষ্কৃত হয় বাংলাদেশের সব থেকে বড় গণকবর। এখানে মাটি খোঁড়ার পর উঠে আসে নাম না জানা প্রায় এক সহস্র শহীদের হাড়–কংকাল। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে স্বজন হারানো মানুষ তাদের প্রিয়জনদের খুঁজে পাবার প্রত্যাশায় ছুটে আসেন এখানে। আপন মানুষকে চিনতে পেরে হাড়–কংকাল আঁকড়ে ধরে কেঁদে ওঠেন কেউ, কেউ বা হারানো স্বজনকে খুঁজে না পেয়ে সকল শহীদের কংকালকেই আপন ভেবে জড়িয়ে ধরেন।